

প্রতিদিনের গঙ্গ

সচলায়তন ফোটোব্লগ সংকলন ২০০৯

প্রতিদিনের গল্প

সচলায়তন ফোটোব্লগ সংকলন ২০০৯

সম্পাদনা

নজমুল আলবাব অরূপ

প্রকাশক

সচলায়তন. c o m ১ম সংস্করন, মার্চ, ২০০৯

প্রচ্ছদ

লেখকদের পাঠানো ছবির কোলাজ

© প্রতিটি লেখা ও সংযুক্ত ছবির স্বত্ত্ব, সংশ্লিষ্ট লেখকের

যাদের লেখা নিয়ে এই সংকলন

অণীক আন্দালীব অনিকেত অভ্ৰ পথিক অরূপ আলমগীর ইমরুল কায়েস ইশতিয়াক রউফ এনকিদু কারুবাসনা কীর্তিনাশা জুলফিকার কবিরাজ টিকটিকির ল্যাজ তুলিরেখা নজরুল ইসলাম নীড় সন্ধানী প্রকৃতিপ্রেমিক `পলাশ দত্ত ফারুক হাসান মাশীদ মাহবুব লীলেন মাহফুজ কবীর মুশফিকা মুমু ্রণদীপম বসু লীনা ফেরদৌস সচল জাহিদ সাইফুল আকবর খান

ভূমিকা

এই বইটা প্রকাশের পেছনের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের প্রতিদিনকার সাদামাটা জীবনের অদেখা বৈচিত্র্যকে তুলে ধরা। লেখার সাথে লেখকেরই তোলা ছবি যে বাড়তি আবেদন যোগ করেছে এই সংকলনে, তা বলাই বাহুল্য।

লেখক, পাঠক, সমালোচক – ধন্যবাদ সবাইকে

নজমুল আলবাব অরূপ

मार्ठ ১৯, ২००৯



প্যাডেল...

'এই খালি...!'

সম্মতিসূচক ব্রেক কষেই রিক্সাটা দাঁড়িয়ে গেলো। ঝটপট চড়ে বসেই বললাম- একটু টেনে যান ভাই, দেরি হয়ে গেছে। মেজাজ ভীষণ খাপ্পা হয়ে আছে। নিজের উপরেই। বাঁ হাতের কব্জিতে ন'টা বেজে দশ। সেই পৌনে নয় থেকে রিক্সার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। তিন রাস্তার মোড়টাতে। একটার পর একটা রিক্সা আসছে যাচ্ছে। কাজীপাড়া, শ্যাওড়াপাড়া, পীরের বাগ, মিরপুর-একে যাত্রীদের নিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এতো কাছের গন্তব্য আমার, মিরপুর দুই'টাই পছন্দ হচ্ছে না তাঁদের। কী আশ্চর্য, চালকের পছন্দেই আজকাল গন্তব্য নির্ধারণ করতে হবে নাকি!

জোরসে টেনে গেলে ন'টার অফিস পৌঁছতে এখনও ন'টা পাঁচিশ বেজে যাবে। লিফট আর হেনতেন করে আরো পাঁচ মিনিট। মানে সাড়ে নয়! খাপ্পা হবো না কেন! গোঁড়ালি ফেটে হা হয়ে যাওয়া পা ঘষটে ঘষটে হাঁটতে থাকলেও তো এতক্ষণে নিজের ডেস্কেই থাকতাম! ন'টাতেই নোট সহ গুরুত্বপূর্ণ ফাইলটা বসের টেবিলে পেশ করার কথা। ছাগলামী করে এই পাঁচিশটা মিনিট রিক্সাই খোঁজলাম। প্রতিবারই মনে হয়েছে, ওই যে পেছনে খালিটা আসছে ওটা হয়তো যাবে। শীট! ঘাট হয়েছে! রেগেমেগে প্রতিজ্ঞাও করে ফেলেছি প্রায়, শালার রিক্সাই চড়বো না আর! পনের মিনিটের হাঁটা পথে আবার রিক্সা কিসের! যাক্, এই রিক্সাটা সাথে সাথেই রাজী হয়ে গেছে।

কিন্তু এ কী ! রিক্সা তো টানছেই না ! শীর্ণদেহী চালককে তাড়া দিতে গিয়েও থেমে গেলাম। চোখ পড়লো রিক্সার প্যাডেলে। গোড়ালির একটু উপর থেকে বেঁকে যাওয়া প্রতিবন্ধী পা'টার দিকে। হাতের চেয়েও সরু হয়ে যাওয়া অক্ষম পা'টার দিকে তাকিয়ে ভেতরের ক্ষোভ উত্থা সব গলে গেলো।

'আপনি শুরুতেই অন্যদের মতো জিজ্ঞেস করলেন না যে, কই যাবো ?' 'ভুল হইয়া গ্যাছে ছ্যার ! রিশকা চালাইয়া খাই, যেইহানে কন সেইহানেই তো যামু। আমাগো আবার...'

হাঁফাতে হাঁফাতে কথাগুলো বললো ঠিকই, বুঝালাম খুব কট্ট হচ্ছে বেচারার। কথা আর না বাড়িয়ে দৃষ্টি নীচু করে একদৃষ্টিতে রিক্সার প্যাডেল ঘিরে পা দুটোর উঠানামা দেখতে থাকলাম। নিশ্চয়ই ঢাকায় নতুন এসেছে। গ্রাম্য সারল্যটুকু এখনো ছাড়তে পারেনি বলে হয়তো জীবিকার তাগিদে রিক্সাচালনার মতো আনফিট কাজটাই নিরূপায় বেছে নিয়েছে। সারল্যে ভরা অসহায় মুখের দিকে চেয়ে আমার নাগরিক জবানিতে তাঁকে আর প্রশ্ন করা হয়নি। জানা হয়নি তাঁর ঠিকানা-সাকিন কিংবা ফেলে আসা জীবনের অজানা গল্পগুলোর কথা। থাক্, কী দরকার ! যে গুপ্ত ট্র্যাজেডির ভার বইতে পারবো না, তাকে উন্মুক্ত করে দায়সারা কূটিলতায় নাগরিক সহানুভূতির ভণ্ডামো দেখানোর অপমানটুকু নাই বা করলাম।

প্রতিজ্ঞায় পূর্ণতা ছিলো না হয়তো। এখনো রিক্সা চেপে প্রায়ই অফিসে যেতে হয়। যথারীতি হাঁকও ছাড়ি 'এই খালি'। তবু দৃষ্টিটা এখন আর চালকের মুখে নয়, কেন যেন ছুটে যায় ঘূর্ণমান প্যাডেলের দিকেই। যেখানে চাপলেই মন্থর জীবন ছুটতে থাকে...!

রণদীপম বসু



তিমির এলার্ম

এইতো সেদিন দুপুর বেলা, উথাল পাথাল ঢেউয়ের মেলা সাগর জলে সাঁতার কেটে করছি আমি খেলা, হঠাত করে কি কে জানে, জাপটে ধরে হাঁচকা টানে ছুটছে জোরে আমায় নিয়ে অথৈ সাগর পানে।

থামল শেষে সাগর তলে, দেখি বিরাট রাজার হলে, মাছ গুলো সব দলে দলে তাকিয়ে আমায় দেখে, মৎসকুমার কাছে এসে, বলছে "আরেহ মানুষ?" কে সে? "ভল করেছো যাও এখুনি, দিয়ে এসো রেখে"।।

টুনা মাছটা "মোস্ট ওয়ানটেড" আছে অকাজ তালে, কিডন্যাপ করে মাছ সে নিয়ে দেয় ধরিয়ে জালে। স্যালমন বলে, "রাজার দাবি টুনা কে আনো ধরে", তাই, তো আমায় টুনা ভেবে ভুল সে মনে করে।

তিমি বলে, "নো চিন্তা একটি হাঁচি দিয়ে"
"এক দুই তিন" এক নিমিষেই পৌছে দেব গিয়ে। যেইনা তিমির নাকের ভেতর ঢুকতে আমি গেলাম, এক দুই তিন বলার আগেই উঠল বেজে এলার্ম।।

মুশফিকা মুমু



সোয়ান রিভার

নদীর তীব্রতা আমাদের ঘিরে রাখে ... তার লঘু স্বর সম্মোহনের তাঁবু ছড়ায় ... প্রচলিত পাখা নিয়ে উড়ে যায় যেসব পরিবর্তনশীল প্রজাতি তাদের নিজস্ব কলেবর থেকে বৃত্ত উঠে আসে ... পড়ে থাকে নুড়ির উঠান ...

শালঘরে জামার ভেতর কোদাল আর মগ্নদেহ লুঠ হয় ... মিশে যায় চিলের আকাশবাজি ঠোঁট ... সাঁতারের চিরায়ত জলে যেসব ঘুম ভেসে থাকে তাদের প্রতিবিশ্বে দেখা হয় আমাদের ... তখন মাঠগুলো উড়ে যায় আর হাসতে থাকা দড়ির ভেতর দিয়ে উদ্ভান্ত ঘোড়ার দল আকাশের দিকে যেতে থাকে ...

সাঁতারের অভিযোজক কাঠামোর ভেতর নদী বেঁধে রাখে আমাদের ...

মাহফুজ কবীর



আহা পুতুল

পুতুলের মাঝখানে শুয়ে আছে একটা পুতুল। এই পুতুলটি তোমার চেনা। মাঝেমাঝে মনে হয় তুমি না-থাকলে এই দুনিয়ায়; ঠিক এই পুতুলটিই হয়তো দুনিয়া দেখতে পেত না?

অথচ পুতুলের এ-দুনিয়ায় চ'লে আসা কতো স্বাভাবিক। কারো সঙ্গে কারোর ভালোবাসায় আধার বেয়ে পুতুলেরা তো সুনিশ্চিত চ'লে আসে এ-দুনিয়ায়।

তবু তুমি বলেই যাবে এই পুতুল একান্ত তোমার!

বলো। পুতুলেরাও বড়ো হয় তোমার মতো পূর্ণপ্রাণবয়স্ক মানুষ; ওরাও সব পুতুল পারে পুতুলের ভালোবাসার আধারে

আর ভুল করে তোমারই মতো ভেবে যাবে-ওই পুতুল শুধুই তার

তোমাদের পুতুল, পুতুলজীবন সাঙ্গ হলো না বুঝি আর

পলাশ দত্ত



ঘড়ির কাটা

সকাল বেলা বিকট সুরে, নাগাল থেকে একটু দূরে, वाजला घिं, मिष्ट्रे निष्, मानुष आमि विजाय कुए চোখটা মেলে, ডাইনে হেলে, হাত বাড়িয়ে এলার্ম খুঁজি পাইলে পরে, থাবড়া মেরে, আবার ঘুমে চোখটা বুঁজি ক্লাসটা শুরুর একটু আগে, ঘুম বাবাজী দৌড়ে ভাগে লাফিয়ে উঠি, জৌরসে ছুটি, ক্ষেপল কি প্রফ? শঙ্কা জাগে পৌছে গিয়ে, পেছন দিয়ে, বাড়িয়ে মাথা দেই যে উঁকি সাইডে বসে, কলম কষে, ভাবটা নিলেম পয়েন্ট টুকি ভাবনা গুলোর চলছে গাড়ি, চোখের পাতা হচ্ছে ভারী ঘড়ির কাটা, আইকা সাটা, নড়ছে না সে বদের হাড়ি অনেক পরে, সবাই নড়ে, শেষ হলো প্রায়, সময় ফুরায় ক্লাসের শেষে, বাসায় এসে, দমটা ফেলি প্রাণটা জুড়ায় পাহাড় সমান পড়ার চাপে, ভয়ের চোটে বুকটা কাঁপে হিসেব কষি, পড়তে বসি, হাত ঘড়িটা সময় মাপে বইটা খুলি, পৃষ্ঠা গুলি, ভীষণ কাঁদায় দুৰুরি ছাই নতুন মুভি, টানছে খুবই, দেখব নাকি? ঠিক বসে যাই এমনি করেই দিনটা গড়ায়, ঘড়ির কাটা টনক নড়ায় রাতটা নামে, ফুর্তি থামে, মনের ভেতর প্যানিক ছড়ায় এলার্ম হাঁকাই, মাথা ঝাঁকাই, কালকে থেকে বদলে যাব ব্যাঙ্গ করে, হেসেই মরে, বলছে ঘড়ি, 'দেখতে পাব!'

টিকটিকির ল্যাজ



ব্যাগ

একখানা ব্যাকপ্যাক বৃষ-স্কন্ধে ঝুলিয়ে, গুনার রাহলেন হাঁটে ভুড়িখানা দুলিয়ে, ভাবখানা দেখে তার করেছিল ঠিক, এমনই এক ব্যাকপ্যাক কিনিবে ফটিক।

যেই ভাবা, সেই কাজ, একখানা ল্যাপি কামলার টাকা দিয়ে কিনে বেশ হ্যাপি। গুনারেরই মতো সে কেনে এক ব্যাকপ্যাক, পড়া শেষে নিজ দেশে অবশেষে করে ব্যাক।

দেশে ফিরে ব্যাগ কার্ষে যায় আপার বাসাতে, তাকে দেখে ছোট ভাগ্নীর দম ফার্টে হাসিতে। বলে সে- 'মামা তোমার কার্ষে কেন স্কুল ব্যাগ? ওরে বোকা এটা হলো ল্যাপটপ ব্যাকপ্যাক।

ভাগ্নীর হাসি আর কিছুতেই থামে না, লোকজনও ওটাকে ব্যাকপ্যাক মানে না। অবশেষে ফটিক আবার নতুন ব্যাগ কেনে, সেই ব্যাগের ছবি তুলে পাঠায় সচলায়তনে।

ভাবে সে- মড়ুদের দ্য়া হলে ব্যাগখানা তার, পাইবে জায়গা একখানা, ই-বুকে ঝুলিবার।

অভ্ৰ পথিক



পথই আমার পথের আড়াল

যদি পথে না নামতাম, তবে আমার কোথাও পৌঁছা হতো না। অপেক্ষায় থাকা হতো না গন্তব্যের।

ছোটবেলায় মায়ের বকুনি খেয়ে যখন দুনিয়াতে আপন কেহ নাই মনে হয়েছিলো, তখন একলা একলা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম পথে পথে। তখনই জেনেছিলাম, পথই আমার পথের আড়াল। সেই থেকে ভালোবেসে ফেলি পিচঢালা এই পথটারে। সেই থেকেই বন্ধনহীন গ্রন্থী আমার আর পথের।

পথেই তুলেছি মুষ্টিবদ্ধ হাত মিছিলের, পথেই ধরেছি হাত প্রিয়জনের। তারুণ্যের মাদকতায় পথে পথেই কেটেছে রাত বিরেত, বাড়ি ফেরার খরচা না পেয়ে ঘুমিয়েছি এই পথেই। পথে পথে দিলাম ছড়াইয়া রে সেই দুঃখে চাক্ষেরো পানি...

পেছনে উদ্যত গুলি নিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি পথেই। পথই আগলে রেখেছে বিপদে ও আপদে, আগুনে ও অভিমানে, শ্বাপদে ও সঙ্কুলে, প্রেমে আর প্রতিশোধে। সহব্লগারের কাছ থেকে শিখেছি- রাজপথ কখনো ভঙ্গ করে না অঙ্গীকার। সত্যিই তাই।

একবার পথ হারিয়েছিলাম, আর অসংখ্যবার চেয়েছি হারিয়ে যেতে। এক পথ থেকে গেছি আরেক পথে, পথের শেষ নেই, অনন্তর মতো বিশাল। সেই পথ পাড়ি দিতে দিতে ভেবেছি, কতোটা পথ হাঁটলে মানুষ হতে পারবো?

পথ থেকে পথে বুনে গেছি খালি নকশী কাঁথার মাঠ। তবু যেন পথ মেলে না, তবু আমি পথ খুজিঁ কেবল... পথ ছুটে যায় যার আঙিনায় সেই পথ মেলে না...

আমি নিত্য নতুন পথে নামি... খুজিঁ নতুন গন্তব্য কোনো...

নজরুল ইসলাম



একটা গ্রাম এবং এক কিশোরের আজীবন মুগ্ধতা

পৌষের নরম রোদেলা বিকেল। নাড়া-তোলা ক্ষেতের আলে অনিচ্ছুক দুটি কৈশোর-পা চপ্পল ঘষতে ঘষতে হাঁটছিল। কিশোরের মাথাটা নীচু, চোখদুটো চাপা কান্নায় জ্বলজ্বলে। সামনে সারিবদ্ধ হাঁটছে বাবা-মা-ভাই-বোন। পাঁচ মিনিটেই মহাসড়ক, তারপর দুঘন্টার বাসযাত্রায় শহর নামের কংক্রিটের জঙ্গল। অতঃপর লম্বা আরেকটা বছর স্কুল-প্রাইভেট-পরীক্ষা-বাসা চক্রে আবদ্ধ। ভাবনায় কৈশোর বুকে হাহাকার।

এই আলের, এই ধূধূ অচষা মাঠের প্রতিটি ধুলিকনা, প্রতিটি ঘাসের ডগা গত এক সপ্তাহে চেনা হয়ে গেছে। প্রতিবারই হয়। করলডেঙ্গা পাহাড় থেকে নেমে আসা স্ফটিক স্বচ্ছ ছড়ার খালের পা ডোবানো জলে ছোট ছোট মাছেদের পিছু ধাওয়া, নাড়ার আগুনে শিমের বিচি পুড়িয়ে খাওয়া, অনতিউচ্চ খেজুর গাছের রসের হাঁড়িতে পেঁপের ডগা চুবিয়ে রস খাওয়া, এত সব সুযোগ্য উপভোগ সাত দিনে কী সমাপ্ত হয়? অতৃপ্ত কিশোরের মাথাটা নীচু, চাপা কান্নার অশ্রুজল নিয়ন্তবের সসংকোচ প্রচেষ্টা।

আজিমপুর সাধারন একটা গ্রাম, কিন্তু কিশোরের চোখে অনন্য। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম। এই গ্রামের সবকিছুতে তার ভালো লাগা। স্ফটিকস্বচ্ছ পাহাড়ী ছড়ার জল, দুইপাড়ে সারিসারি বাঁশঝাড়, সবুজ বন-বনানী, পাখপাখালির কলকাকলী। এমন গ্রাম কোথায় আছে? না কবিতায় না ছবিতে, কোথাও নেই এমন একটা গ্রাম। এমন মায়া যার জন্য সেই গ্রামে জন্ম কিংবা স্থায়ীবাস কিছুই হয়নি তার, এমনকি পরিবারের আপন কেউ থাকে না। পূর্বপুরুষের ভিটে বলেই কেবল বেড়াতে যাওয়া হয় বছরে একবার। কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মায়ায় ফি-বছর বিদায়বেলায় সেকি নাড়িছেঁড়া কান্না। বড় হলে বারবার ফিরে আসবে প্রতিজ্ঞা করে কিশোর। আসা হয় না আর। যৌবনের উদ্দামতায় চাপা পড়ে যায় কৈশোরের কান্না।

সেই কিশোর যৌবনের প্রান্ত ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বে উন্নীত এখন। একদিন গ্রামে গিয়ে দেখে কংক্রীট আগ্রাসন এখানেও। তবু ক্ষেতের অবশিষ্ট আলে সারাদিন হেঁটে হেঁটে ডিজিটাল ছবিতে কৈশোরের স্মৃতিগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু বিকেল না গড়াতেই ডাক আসে - 'বাবা চলো, সন্ধ্যার আগেই বাসায় পৌঁছাতে হবে'।

ফেরার সময় বড় রাস্তার একটু আগে হোঁচট খেয়ে পেছনে তাকায় প্রৌঢ়। চোখদুটো জ্বলছে, চশমাটা ঝাপসা লাগছে। অনেক কিছু বদলে গেছে, অনেক অনেক। কেবল বদলায়নি গ্রাম ছেড়ে যাবার বেদনাটুকু, সেই মায়া, সেই কৈশোরের অশ্রুজল, অবিকল।

নীড় সন্ধানী



আমি আর মাউস

সারাদিনের সঙ্গী রে তুই ছোট্ট সোনা ইদুঁর তোকে ছুঁয়ে মন থাকে সারাক্ষণ রাত কাটে যে তোর বিহনে বিরহ-বিধুর।

বিশাল লম্বা লেজ যে তোর পেটখানি যে ঢাউস ছোট্ট শরীর খানা যেন ইদুঁর ছানা তাইতো তোকে ইদুঁর ডাকি ওরে আমার মাউস।

বন্ধুরা সব ভুলেই গেছে দিসনি তুই যে ফাঁকি সকাল-দুপুর-সাঁঝে হাতের মুঠোর মাঝে তুইযে আমার বড্ড আপন তাইতো ছুঁয়ে থাকি।

একটি কথা জানিস কি তুই ছোট্ট কাল মাউস যত না ছুঁই তোকে অত না ছুঁই তাকে চিরদিনের সঙ্গী যে মোর- একটা মাত্র স্পার্ভস।

লীনা ফেরদৌস



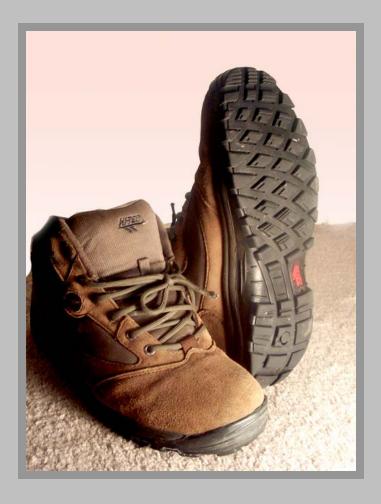
মগ

মগটি অধিকাংশ সময়ই এরকম সিগারেটের ফিল্টারে ভরা থাকে। যারা দেখে তারাই অবাক হয়, এত সিগারেট খায়! যদিও আমি গুনে গুনে দিনে চার-পাঁচটা সিগারেট খাই তারপরেও তাদের অবাক হওয়ার জন্য মগটি পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রাখি।

পেয়েছিলাম আমার এক মামার কাছ থেকে। যখন বুয়েটে ভর্তি হয়ে প্রথম তার সাথে দেখা করতে আসি, মগটি তখনও এরকম ভরা ছিল। তখন সিগারেট খেতাম না। এই মগটা দেখে আমিও তখন ভেবেছিলাম, হায়রে ইনি কতই না সিগারেট খান!

পরবর্তীতে সেই মামার রুমেই এক টার্ম পরে উঠি এবং উনি বের হয়ে গেলে উত্তরাধিকারসূত্রে মগটি আমি পাই। প্রথমদিকে এটাতে পানি খাওয়া হলেও কালের বিবর্তনে এবং দেশে বেনসন এন্ড হেজেসের একজন ভোক্তা বেড়ে যাওয়ায় তাকে আবার তার পুরনো কাজে ফিরে যেতে হয়, আশ্রয় দিতে হয় অজস্র পোড়া সিগারেটের ফিল্টারকে।

ইমরুল কায়েস



জুতাকাহিনী

আমার যখন কানাডায় আসার কথা হচ্ছে তখন সবার আগে মাথায় এলো গরম পোষাকের কথা। শুনেছি বঙ্গেই সস্তায় গরম কাপড় পাওয়া যায়। পরিকল্পনা করছিলাম কখন বঙ্গে যাবো। গরম পোষাকের সাথে গরম জুতার প্রসঙ্গও এলো। দেশী জুতা কি কানাডার ঠান্ডা কাটাতে পারবে? মধ্যপ্রাচ্যের গরমে নাকি আমাদের জুতাগুলো ফেটে যায়। তাহলে কানাডার ঠান্ডায় নিশ্চই ওগুলো মোমের মত জমে যাবে। এটা ওটা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত বাটা থেকে একজোড়া কেনা হলো। আরেকজোড়া এলো নেপালের হিমালয়ের পাদদেশ থেকে। ২০০৩ এর এপ্রিল বা মে মাসে দুর্দম ছোটভাই নেপাল থেকে কিনেছিল আঠারো ডলার দিয়ে। সেটাই এখন কানাডায়। সেই থেকে আজ অবদি জুতাজোড়া আমার সঙ্গী।

কনকনে বাতাস, কিংবা হিম শীতল বরফ সবকিছুইকে ছাপিয়ে সুরক্ষিত রেখেছে আমার পা দুটি। কতবার আছাড় খেতে খেতেও বেঁচেছি জুতাজোড়ার কল্যাণে তার হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। পিচের মত কালো রাবারের সোল, ট্যাংকের চাকার মত খাঁজ কাটা। পথের সব চড়াই উৎরাই দুমড়ে-মুচড়ে মিশে যায় তার ঔদ্ধত্যের কাছে। নি:শব্দে চলি আমি তার উপর ভর করে।

এতদিন পরে গায়ের কোথাও কোথাও চামড়া উঠে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এটাই শেষ, পরের শীতে নতুন একটা কিনব। দোকানে গিয়ে এটা ওটা পায়েও দেয়া হয়, কিন্তু কোনটাকেই এর মত আরামের মনে হয়না। ওকে আর ফেলে দেয়া হয়ে ওঠেনা। রয়ে যায় আমার সাথে। এভাবেই পাঁচ বছর ধরে চলে যাচ্ছে; দেখা যাক, কতদিন চলে।

প্রকৃতিপ্রেমিক



গিফ্ট

বোশেখ মাসের পয়লা দিনে বাবা আনলেন ঢাকি, এটা বড্ড কাজের জিনিষ নেইকো এতে ফাঁকি।

নববর্ষের খুশির দিনে নাইবা পেলাম গিফট্, এই দেখনা ঢাকি আমার কেমন হইছে ফিট।

জুলফিকার কবিরাজ



রাজপথ

প্রবল আলো-মাখা পথ মৃদু ঝাঁকিতে আমার সামনে তাতাথৈ নৃত্যে মাতে আমি শুধু সেইপথে নিজেকে ধরে রাখতে চাই। আকাঙক্ষার গায়ের রং জানা নেই বলে, আমি নিয়মিত ব্যর্থ হই, মগ্ল হই এবং শ্রান্ত হই

পরাক্রান্ত গোলাকার অতিকায় মহীরুহ চোখের সামনে স্ট্রীটলাইট বনে যায়, কিংবা উল্টো নিয়মে কিছু হলুদ সোডিয়াম বিশ্বিসার বনের মাঝে আমাকে ডাকতে থাকে। এহেন চাতুর্যে হতবাক হলেও কিছু করার থাকে না বহুরূপী মানুষের চেয়ে কোমলাভা সোডিয়াম লাইট ভালো

সমুখের রাত তাকে কুর্নিশ করছে- এমন বিভ্রম ঘটে এবং চকিতেই আমি পুরো ঘটনাটি বুঝে উঠতে পারি হা লুম্বিনীর রাত! অবোধ্য চিৎকার মেখে নিথর থমকে থাকো!

জন্মান্তর হবে না জেনে গৌতমের কেমন লেগেছিল সেই সত্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়!

অণীক আন্দালীব

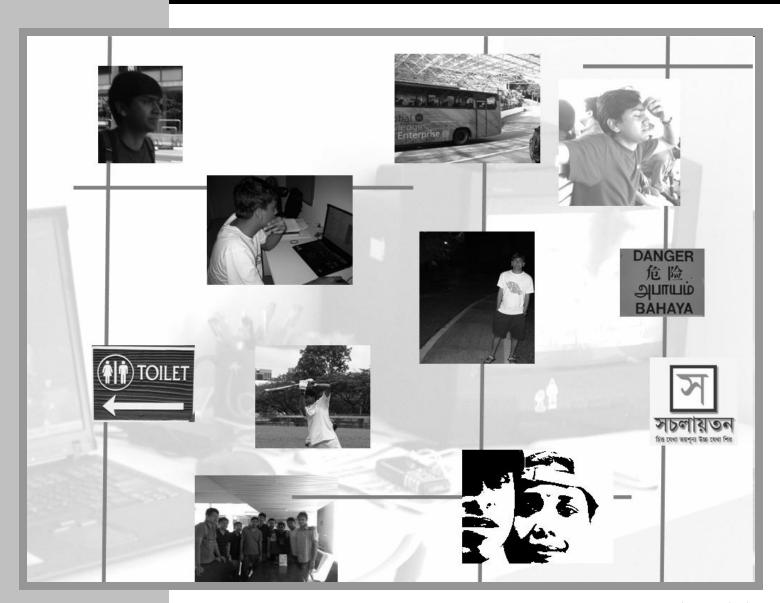


আমার প্রতিদিনের গল্প

প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আমার প্রধান কাজ হল কাউচে শুয়ে টিভি দেখা। রান্নার শো (যদিও সেগুলো রান্না করা হয় না), ট্র্যাভেল শো (যদিও সেসব জায়গায় যাওয়া হয় না), নানা রিয়্যালিটি শো (না, সেসব আমা জীবন থেকে নেওয়া নয়), কোন এক সিরিজের কোন এক এপিসোড (যা হয়তো রেগুলারলি ফলো করতে পারিনি), যা দেখায় তাই দেখি। মাঝে মাঝে টিভি দেখতে দেখতে কাউচে ঘুমিয়েও পড়ি। আমার টিভি দেখার সময়টায় অপু কাউচের পাশে ওর ডেস্কটপের ক্ষীনে সচলায়তন বা ফ্লিকারকে নিয়ে বসে থাকে. পা দুটো কাউচের হাতলের উপর তুলে দিয়ে। মাঝে মাঝে দুজন চা খাই, অথবা ওল্ড টাউন ওয়াইট কফি। অফিসে কোন ক্যাচাল চলতে থাকলে হয়তো কিছুক্ষণ সেটা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করি, অপু ছবি তোলার কোন নতুন টেকনিক (হয়তো HDR, নয়তো বোকে) ট্রাই করতে করতে সেটার গল্প করে। টিভি দেখার ফাঁক-ফোকড়ে কাউচে রাখা অপুর V শেপড় পা দুটোর দিকে তাকাই। থ্যাবড়া থ্যাবড়া বিশাল পার পাতা দুটো পিছন থেকে দেখে মাঝে মাঝে ফ্লিপারের মতো লাগে, আবার মাঝে মাঝে কোন মজার ক্লাউনের চ্যাপ্টা বড় জুতো পরা পায়ের মতো মনে হয় কেন জানি। খুব মজা লাগে, আনমনেই হয়তো হেসে ফেলি। দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে ওকে দেখি আর ভাবি, ওর ক্যামেরা আর 35 mm f / 1.4 L লেসটা বাগিয়ে পা দুটোকে ফোকাস করে আর ওর মুখটাকে বোকে করে একটা ছবি তুলতে হবে কোন একদিন.

মাশীদ

ফাহার প্রতিদিন





স্টিকার

আমার বাসা তাত্ত্বিক ভাবে ঢাকা মহানগরীতে হলেও ব্যবহারিক ভাবে তাকে ঢাকা শহরের বাইরেই ধরা যায়। আমার জন্য ঢাকা শহরে যাওয়ার সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হল বাড়ি থেকে বের হয়ে পাঁচ মিনিট হেঁটে একটা রেইলক্রসিং পার করে মহাসড়কের পাশের বাস স্ট্যান্ড থেকে একটা বাসে উঠে পড়া।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী নিয়ে প্রথম স্টিকার ছাপিয়েছিলাম আমরা প্রায় দুইমাস আগে। প্রথম দিকে লাগান স্টিকার গুলোর একটা ছিল এই বাস স্ট্যান্ডের সাথে লাগোয়া ল্যাম্পপোস্টে। পরে যখন অভিজ্ঞতা থেকে জানলাম, যেখানে বেশি লোকের চোখে পড়ে সেখান থেকেই কারা যেন স্টিকার গুলো তুলে ফেলার চেষ্টা করে, তখন থেকেই মনের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিল এই স্টিকারটাও হয়ত কেউ তুলে ফেলবে। কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক পরেও বাসায় এসে দেখি স্টিকারটা এখনো অক্ষত আছে। কুয়াশায় ভিজে আর রোদে শুকিয়ে একটু বিবর্ণ হয়েছে বটে, তবে বেশ ভাল ভাবেই ল্যাম্পপোস্টের বক্রতল আঁকড়ে ধরে আছে। এর পরেও যতবার বাড়ি গিয়েছি, প্রতিবারই বাস স্ট্যান্ডে বিবর্ণ হয়ে আসা কিন্তু আগের জায়গায় অনড় স্টিকারটা আমার দিকে দাঁত কেলিয়ে হেসেছে।

পরীক্ষার পর হলের আসন ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। এখনও দেখি স্টিকারটা আগের জায়গাতেই আছে। হলুদ রঙ জ্বলে প্রায় সাদা, কাল রংটাও আর আগের মত নেই, কিন্তু তার অবস্থান এখনো অনড়। চা-তামাক ভাল লাগলেও তা কোন কালেই নেশার পর্যায়ে ছিলনা। কিন্তু এই স্টিকারটা আমাকে একটা মারাত্মক নেশায় ফেলে দিয়েছে। প্রতিদিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে ঠিকই স্টিকারের একটা বান্ডিল পকেটে ঢুকে পড়ে। বাসে উঠে বসার পরেই কিভাবে যেন একটা স্টিকার পকেট থেকে হাতে চলে আসে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কিভাবে যেন ঠিকই সুবিধামত জায়গা আমার চোখে আটকে যায়।

অনেকে বলে এসব করে নাকি কোন লাভ হবেনা, বিচার হবেনা যত যাই বল। এই কথার সত্য-মিথ্যা জানিনা, এখনো জানার সময় হয়নি। তবে এই স্টিকারট লাগানর কাজটা যে আমার একটা দারুন নেশায় পরিনত হয়েছে - এই কথা একশত ভাগ সত্যি। আর বাসার কাছের বাস স্ট্যান্ডের লাগোয়া ল্যাম্পপোস্টের স্টিকারটা আমার সেই নেশাকে প্রতিদিন নতুন করে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এনকিদু



আলমগীরনামা

"বইটা ছিঁড়েছি বাবা আরেকটা কিনে এনো"
"কোনকালে কফি খেলে মগটা নড়েনা কেন?"
জীবনটা ফানাফানা গাদাগাদা ভুলেরা
ঝরছেই ঝরবেই মুঠোধরা চুলেরা।
মাথাধরা হাতেকড়া টেনশন অম্বল
গুটাতে হবে কি তবে চাটিবাটিকম্বল?
রক্তটা ঠাণ্ডা; আর তো চাপেনা রোখ
থিসিসের সম্বল মনিটরে টেপে চোখ।।

আলমগীর



দাদু এসেছে, দাদু!

এক

মা অনেক রকম কসরত করে আসবাব-পত্র তৈরি করতো। একটু একটু করে সঞ্চয় করে, কিস্তিতে টাকা দিয়ে, অনেক দফা দরদাম করে। ফ্রিজ, টেলিভিশন, আলমারি, খাট, বুকশেলফ, ওয়ার্ডরোব, পড়ার টেবিল, ইত্যাদি সব কিছুই এসেছে একটু করে।

হঠাৎ করেই চলে এল প্লাইউডের জগৎ। বার্নিশ করা কাঠের জৌলুস কেড়ে নিল খড়খড়ে আ-কাঠগুলো। প্রবাসে এসে অনেক কিছুর মতই প্লাইউডের ব্যাপারেও মত বদলে গেল। প্লাইউড না থাকলে আমার মাপের লোকজনের আসবাবহীন ঘরে থাকতে হত।

সুলভ মূল্যে প্লাইউড পাওয়া যায় বলে আমার ঘরে আসবাব আছে, কথাটি সেই অর্থে বলা না। প্লাইউড সুলভ, তাই কেউ কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যায় না শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়। অধিকাংশের জন্য এটি অতি-সুলভ, তাই সিমেস্টার শেষ হলেই ডাম্পের আশে-পাশে আমার ঈদ লাগে।

দু'বছর আগে সিমেস্টারের শুরুতে তেমনি এক ঈদ এল আমার জীবনে। কুড়িয়ে পেলাম ঝকঝকে একটা কম্পিউটার টেবিল। আজতক সেটাই আমার ঘরের একমাত্র আসবাব। এখানেই খাওয়া, পড়া, খেলা। আনন্দে ডগমগ করতে করতে টেবিল নিয়ে বাসায় আসছিলাম, হারকিউলিসের মত দু'হাতে উচুঁ করে ধরে। বাসার সামনের ঢাল বেয়ে নেমে আসবার পথে পা মচকালাম। সেই থেকে শুরু।

দুই

চোখ গেছে শৈশবে, দাঁত গেছে তারও আগে। চিরকালই ক্লান্ত, লিকপিকে, কুঁজো। এবার সাথে যোগ হল খুঁড়িয়ে হাঁটা। পায়ে শক্ত পট্টি, আর হাতে লাঠি নিয়ে চলতে লাগলো দিন। ছিঁড়ে যাওয়া সেই লিগামেন্ট সারতে সময় লাগতো কয়েক মাস। সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার কথা ছিল।

কিছু ছবি হাজারটা শব্দের চেয়েও কার্যকর। বিশ্রাম ও শুশ্রুষার উপদেশের প্রতি আমার মনোযোগিতা এই ছবিটাই বলে দেবে।

আবহাওয়া একটু ভাল হলেই আমরা দশ-পনের জন নেমে যাই খেলতে। উৎসাহের আতিশয্যে ক্লিটস-জ্যাঙ্কলেট কিনে ফেললাম, তাপমাত্রা ৪৫ ফারেনহাইটের উপর থাকলেই খেলাগুলা। এমনই এক দিনের কথা। সবাই যাচ্ছে খেলতে, আমি কি বসে থাকতে পারি? পায়ের ব্যাথা নিয়েও খেলতে গেলাম। আবারও পা মচকালো। দু'দিনের বিশ্রাম, এরপর আবার খেলতে যাওয়া, আবার মচকানো।



দু'বছর ধরে চলছে এই ভাঙা-গড়া। ব্যথা বাড়লে ডাক্তারের কাছে যাই মাঝে মাঝে। কথোপকথন গুলো ছিল অনেকটা এরকম।

- তুমি আবার?
- হু, ভাল আছেন?
- আমি তো ভালই। তুমি কেমন?
- ভাল বলেই তো এলাম, অনেক দিন আপনার খোঁজ নেওয়া হয় না।
- অনেক হয়েছে, পাখি। গলা-ব্যথা? জুর?
- উহু, পায়ে ব্যথা।
- অন্য পায়েও ব্যথা পেলে?
- না, আগেরটাতেই।
- এই নিয়ে ক'বার হল?
- জ্বী, তিন সপ্তাহে তিনবার।
- প্রথম যেবার এলে, সে-হিসেব কোথায় যাবে?
- ঐ হল।
- এবার কীভাবে ব্যথা পেলে? কী যেন খেলাটা খেলো তোমরা?
- ক্রিকেট খেলতে গিয়ে গত দু'বারে ব্যথা পেয়েছিলাম। আমার কোন দোষ নেই, আমি সাবধানেই খেলছিলাম। আগের রাতের বৃষ্টিতে টেনিস কোর্ট ভেজা ছিল, সাবধানেই খেলছিলাম। তবে পপিং ক্রিজে গর্ত ছিল একটা।
- হোয়াই উড আ ক্রিজ পপ?
- হল গিয়ে কী, বলটা ছাড়ার আগে একটা লাফ দিতে হয়। তুমি যদি ডানহাতি হও, তাহলে বাম পা সামনে পড়বে। তো ঐখানে যখন পা দেই...
- আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আবার বেঁখে দিচ্ছি। এবারে অন্য কী খেলা খেলতে গিয়েছিলে?
- খেলিনি। একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। এখান থেকে মাইল দশেক পূর্বে গেলে একটা জায়গা আছে। খুব সুন্দর। সেদিন সবাই মিলে ওখানে গিয়েছিলাম।
- সোইউ ওয়েন্ট টু দ্য মাউন্টেইনস?
- না, মাত্র তো দু¹মাইল উঠতে হয়। আড্ডা দিতে দিতে হাঁটছিলাম, হঠাৎ মট করে আওয়াজ হল, পা মচকে গেল।
- যেতেই কি হত?
- শুনলাম খুব সুন্দর একটা ঝর্ণা আছে, তাই না যেয়ে পারলাম না। বোঝই তো, সবাই গেল তাই আমিও জুড়ে গেলাম।
- ক্যাসকেডস?
- হু, সেটাই তো নাম দেখলাম।
- সোঁ ইউ ওয়েন্ট হাইকিং।
- না, এমনি পাহাড়ে হাঁটছিলাম।
- সো ইউ ওয়েন্ট হাইকিং।
- আমি তো শুধু ঝর্ণা দেখলাম।

- ইউ প্রমিসড টু স্টে আওয়ে ফ্রম গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস।
- খেলিনি তো, শুধু একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম। ব্যথা পাওয়ার সাথে সাথেই বরফ-শীতল পানিতে পা ডুবিয়ে রেখেছিলাম, গাছের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়ে নিয়েছিলাম।
- হয়েছে। আই'ল নো ইফ ইয়ু গো ফর স্পোর্টস অ্যাগেইন। মাঝে মাঝে ঘরে বসে থাকার মধ্যে কোন সমস্যা নেই।
- তথাস্ত্র। ওদিকে আর যাবো না, সেবার চার বার সাপের সামনে পড়েছিলাম। ক্রিকেট বা সকারও খেলবো না নাহ্য় কিছুদিন। এমনিতেও ঠান্ডা পড়বে।

এভাবেই কেটে গেল দিনের পর দিন। কখনও মিনমিন করে বলতাম, লাঠি নিয়েই গাছে উঠেছিলাম, লাফ দিয়ে নামার সময় মচকেছে। কোনদিন বলতাম, সকার খেলতে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছে। ব্লুকুটি উপেক্ষা করে খুশি মনে বলতাম, পায়ে ব্যথা পেলেও দু'গোলে জিতেছি।

মাঝে কয়েক সপ্তাহ করে বিরতি দিয়ে প্রায় দু'বছর ধরে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছি। আমার প্রতিদিনের গল্প তাই লাঠির গল্প। আমার ক্লাস এইটে-পড়ুয়া ছাত্রী দাদু ডেকে বসে একবার ঠাট্টা করে। দাওয়াতে গেলেই বাচ্চারা হৈ হৈ করে বলে ওঠে, দাদু এসেছে, দাদু!

সবই কপাল।

ইশতিয়াক রউফ



জীবনঃ প্রবাহ-পঁগাচ-পয়জার

- ১. একেকটা দিন আসে অনেক প্রবল প্রখর আওয়াজ দিয়ে- শয্যাপাশের জান্লা দিয়ে আততায়ী আলো ছুঁড়ে, সেলফোনের তীক্ষè নাছোড় জাগরঘণ্টা বাজিয়ে। কিন্তু জীবন থেকে আরো চবিবশ ঘণ্টাটি কিংবা ক্যালেন্ডার থেকে আরেক তারিখটা মুছে যাওয়ার সময়, রাতটা একটু কিছু ব'লে পর্যন্ত যায় না। চিত-কাতের মধ্যেই জানি না কখন অচেতন হই দরকারী আপদের অভ্যস্ত ভরসায়- দিন এসে ঠিকই আবার টেনে-হিচঁড়ে উঠিয়ে নেবে কাজের পথে। "বয়স বাড়ে, আমি বাড়ি না"র পুরোনো ফাঁপরেই হাতড়ে চলা, চালিত হওয়া না-দেখা ইশারায় কিংবা প্রকৃতির মনোহীন অমোঘ অনির্দিষ্টতায়।
- ২. মাস-মজুরির আরো একটা দিনশেষে হঠাতের ফুরসতে পালাকার'র স্টুডিও থিয়েটারে ঢুকি গিয়ে, শামিল হই ফ্রান্জ জেভিয়ার ক্রোয়েত্জ-এর 'রিকোয়েস্ট কনসার্ট'-এ। সৃষ্টিশীলতার দক্ষ নির্মাণে দেখি জীবনের অবাক নির্বাক সূক্ষ্ম প্রতিরূপ। নিজঘরে মাঝবয়সী একলা নারীর জীবনের শেষ রাত সন্ধ্যায় কাজশেষে ঘরে ফেরা থেকে শুরু ক'রে আতঞ্চমগ্ন এটাওটায় চ'ডে গভীর রাতে আতঞ্চাত "ছুটি, এ অনন্ত ছোটাছুটি হ'তে, ব্যর্থ শূন্যপানে!"
- ৩. নাট্যসন্ধ্যায় সঙ্গী হয়েছিল নাট্যকারুর পুরোনো চারুসঙ্গী, যার সঙ্গে যৌবনের এই পরসন্ধ্যায় আচানক চলে কিছু ভাবালুতা, বিমূর্ত ছুঁয়ে যাওয়া কেবল মনের আনাচকানাচ। একলা দু'টো আকুল মনে পাশাপাশি ভাবাভাবি চললো বুঝি কে আমরা কীভাবে করবো শেষে জীবন কিংবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন!
- ৪. নাটক থেকে, নাটুকে সেই সন্ধ্যা থেকে ফিরে এসে একলাবাসের একঘরে সেই চিলেকোঠায় ঢুকতে গিয়ে উদাস ছাদের আঁধার-আঙিনা থেকে প্রতিরাতের মতোই চোখ চ'লে যায় বাড়ি-বাড়ি জান্লা-সারির আলোগুলোয়, আশা আর ভালোবাসার দিব্যি বসতি যেখানে দোদুল দোলে চেনাসুরের জোয়ারভাটায়।
- ৫. অনীহার ক্লান্ত পায়ে ঘরে ঢুকে মিলিয়ে দেখি শেষ নির্বাসনের স্বেচ্ছাঠিকানার একোণ-ওকোণ ঠিকবেঠিক। নামেমাত্র আসবাব আলুথালু নোংরা হচ্ছে দিনকেদিন। বেহাল বেচাল ঘোরের ফেরে আলিঝালি প্রাণভোমরা নিয়ে কী নিস্পৃহ চলছে বসবাস!

মোষ তাড়ানোর দিন / বিবর্ণ মলিন।
টানাপোড়েনের রাত / কিবলই চিত-কাত।
চাকায় রাত্রিদিন, / চাকাতে দিনরাত
চক্রবৃদ্ধি ঋণ, / নিয়মের উৎপাত।

বাড়াবাড়ি পুনশ্চঃ

ওখানেই শেষ হ'তে পারতো। কিন্তু, ঘরের ছবি মুঠোয় ক'রে পরদিন কাজে ঢুকতে যখন দেখি গত দুপুরের হঠাৎ দুর্ঘটনায় জ্ব'লে গিয়ে খুলে পড়া বিদ্যুতের তার আজও অমন পেঁচিয়ে আছে নির্ণয়ের অতীত, মনে ভাবি এই প্যাঁচও একসময় ছুটবে নিশ্চয়, দুরন্ত ছুটে যাবে অন্য কোনো প্যাঁচের দিকে।

সাইফুল আকবর খান



আমার নক্ষত্র

ছবিটি কি দূরবীক্ষন যন্ত্রে তোলা আমাদের ছায়াপথের অচীন কোন গ্রহের, নাকি দূরের কোন নক্ষত্রের , নাকি আমাদেরই প্রাত্যাহিক জীবনেরই চেনা কোন কিছু ?

মাঝারী রকম আকারের একটি ঘর, একপাশে বিশাল একটা জানালা তার পাশে একটি রকিং চেয়ার, যাতে দোল খেতে খেতে আমি প্রতিদিন আকাশ দেখি, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি আকাশটাকে কেন জানি নিজের মনে হয় সবসময়। আকাশের পানে দিকে তাকিয়ে কখনো মন চলে যায় দেশের পানে, আপন সুরেই গেয়ে উঠি 'এই দূর পরবাসে তারা গুনে আকাশে আকাশে কাটে নিঃসংগ রাত্রি গুলো।' আমার বিছানার পাশে ছোট একটা টেবিল তাতে দু্'একটা কবিতার বই কিংবা গানের খাতা, কখনো কখনোবা তাতে বায়ান্নটি তাসের বাস।পাশে অগোছালো কিছু কাপড়চোপড়, কাল রাতে শেষ করা চায়ের আধোয়া একটি কাপ......গতানুগতিক একঘেয়ে নিসংগ জীবন।রাত গভীর হয় কিন্তু ঘুম আসেনা দু'চোখ বুজে, টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে ল্যাপটপটা নিয়ে বসে পড়ি, কিছু লেখালেখির চেষ্টা করি কিন্তু দীর্ঘদিনের অনভ্যেসে মরচে পড়া এই হাত দিয়ে বের হতে চায়না কিছুই।টেবিল ল্যাম্পটার ঢাকনা খুলে ফেলে উপর থেকে আমার আনাড়ী হাত দিয়ে একটা ছবি নেই। রাতের এই নিঃসংগতায় একেবারে সাধারন একটি ছবি আমার কাছে হয়ে উঠে জীবন্ত, যেন দূর আকাশের একটি নক্ষত্র যার বিচরন আমার দুরদৃষ্টিতে।

সচল জাহিদ



ডার্টগেম

ছেলেটি ডার্টগেম-এর একটা সেট উপহার পেয়েছিল সেই ছাত্র জীবনে। এক বন্ধুর তরফ থেকে জন্মদিনের উপহার ছিল ওটা। সেই থেকে ডার্টবোর্ড আর তার ছোট ছোট তীর গুলো ছেলেটির সঙ্গী হয়ে আছে। মূল ডার্টগেমের নিয়ম সে কিছুই জানে না। তাই নিজের নিয়মে চলতো তার ডার্ট খেলা।

সেই ছাত্রজীবনেই সে ডার্টের ওপর বাজী ধরতো। অন্য কারো সাথে নয়। নিজের সাথে নিজে। যেমন – পরীক্ষার দু'দিন আগে পড়তে আর ভালো লাগছে না, সে বাজী ধরলো – যদি ১০-এর ঘরে ডার্ট লাগাতে পারি তবে আজ আর পড়াশুনা নয় বন্ধুদের সাথে আড্ডা হবে। আর যদি ষাঁড়ের চোখে (বুল'স আই) লাগাতে পারি তবে মধুমিতায় সিনেমা দেখা হবে।

আবার কখনো এমন বাজীও হতো – যদি ১-এর ঘরে ডার্ট ফেলতে পারি তবে আজ কলেজ ফাঁকি দেব। আবার মাসের শুরুতে যখন টিউশনির টাকায় পকেট গরম তখন বাজী ধরা হতো – যদি অমুক ঘরে ফেলতে পারি তবে পকেটের সব টাকা দিয়ে বই কেনা হবে। আর অমুক ঘরে ফেলতে পারলে হাফ টাকা দিয়ে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এভাবেই ডার্ট নিয়ে বেশ মজায়ই দিন কাটতো তার। এখন এই বিবাহিত জীবনও ভালোই কাটে। যদিও লক্ষ্যভেদে সে মোটেই পটু নয়। প্রায়ই দেখা যায় যেখানে ডার্ট গাঁথার কথা সেখানে না গেঁথে, গেঁথেছে পুরো উল্টো দিকে।

বিয়ের পরে বউ-এর সাথে ছেলেটির নানা সময়ে বাজী ধরতে হয় নিজেকে বাঁচানোর জন্য। প্রায় প্রতিদিন রাতে মশারি কে টাঙাবে তা ঠিক করা হয় এই ডার্ট আর ডার্টবোর্ড দিয়ে। আবার ছুটির দিনে বাজার করা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে কিনা তার সিদ্ধান্তও ঐ ডার্টবোর্ড থেকেই আসে। বউটা তার সানন্দে এই ডার্ট-বাজী মেনে নিয়েছে। সে রীতিমত উপভোগ করে এ খেলা। আর করবে নাই বা কেন? সেই প্রেমিকা থাকা অবস্থাতেই সে এই জিনিসের ভুক্তভোগী। সেই কাহিনী বলেই বরং এই লেখার যবনিকা টানি।

ছেলেটির সাথে মেয়েটির তথনো বিয়ে হয়নি। তবে প্রেম চলছে চুটিয়ে। সেই সময়ে একদিন ছেলেটির বাসায় সে ছাড়া কেউ নেই। মওকা বুঝে ছেলেটি তাই মেয়েটিকে ডেটিং-এর দাওয়াত করে নিজের বাসায়। কিন্তু মেয়েটি আসতে নারাজ। সে ছেলেটিকে বিশ্বাস করতে চায়না। কিন্তু ছেলেটি মেয়েটিকে আশ্বাস দেয় — নরমাল ডেটিং-এ যা হয় তাই হবে। মেয়েটি না চাইলে তার বেশি কিছু কিছুতেই হবে না। মেয়েটি তাতে আশ্বস্ত হয় এবং একটু সময় পরে গুটু প্রায় পায়ে ছেলেটির বাসায় হাজির হয়।

তারপর নানা কথার ফাঁকে ছেলেটি মেয়েটিকে ডার্টগেমের মাহাত্ম বোঝায়। মেয়েটিও বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে। তখন ছেলেটি বলে – চলো আমরা বাজী ধরি। যদি আমি ১-এর ঘরে লাগাতে পারি তবে আমি যা চাইবো তাই হবে। আর এর বাইরে যেখানেই লাগুক, সব কিছু তোমার মর্জি মতো হবে।

কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই রাজি নয়। সে বলে এতদিন টার্গেট প্রাকটিস করে ছেলেটির নিশানা নিশ্চই খুব ভালো অতএব এই ফাঁদে সে পা দেবে না। ছেলেটি তখন মেয়েটির দিকে ডার্ট এগিয়ে দিয়ে বলে — ঠিক আছে তবে তুমিই ডার্ট ছোঁড়ো। শর্ত সেই একই: ১-এর ঘরে লাগলে ঘটনা আমার মর্জি মতো ঘটবে, আর যদি তার বাইরে লাগে তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে।

তারপর মেয়েটি অনেক গাঁইগুঁই কবে রাজি হলো। কারন বিশ ভাগের ঊনিশ ভাগ সম্ভাবনাই তো তার দিকে।

সে যাক গে আমার কাহিনী এখানেই শেষ। ফলাফল কি হয়েছিল তা এখানে উহ্য থাকাই শ্রেয়। তবে এটুকু বলে রাখি নিশানায় মেয়েটির হাত যে খারাপ হবে তার প্রমান সে প্রথম দিনেই রেখেছিল।

(বি দ্র: বউ-এর হাতে খোলাই খাবার সমুহ সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে কাহিনীটি উত্তম পুরুষে লেখা হলো না)

কীর্তিনাশা



ফাগুন হাওয়ার আগুন ছোঁয়া

১. সোনালী ওড়না পরা নীলনীল দিনগুলো চলে যায় রুন্রুন্ নূপুর বাজিয়ে।ওরা থাকে না, ওরা থাকে না। রোজ খালি হাতে ঘুরে বেড়াই আর ভাবি হয়তো কোথাও থেকে যায় কিছু, এই মনোহরণ রূপ কি এত নিরাসক্ত, এত নির্বিকার?এত অবহেলায় ডুবে যায় কালের সাগরে?

একদিন হাতে এলো ক্যামেরা, যা দেখি তারই ছবি তুলতে মন চায়,পাগল-পাগল অবস্থা। উপরে তাকাই, ঝলমল করছে সোনারোদ চিরল চিরল পাতায়। ক্যামেরা তাক করে বাটন দাবাই,ক্লিক করে একটা শব্দ-পরক্ষণেই ছবি। মনে পড়ে যায় ডিজিটালপূর্ব সেইসব দিনে কতদিন অপেক্ষা করে থাকতে হতো ছবির জন্য।

এখন সব তাতৃক্ষণিক। হয়তো ভালোই।মানুষের ধৈর্য আজকাল কমতেকমতে তলানিতে ঠেকেছে। একদিন হয়তো আর থাকবেই না। সে কি ভালো হবে? কিজানি!

- ২. সবুজ গুল্মে আলোছায়ার অপরূপ কারুকাজ দেখে মন মানে না, আরেকবার ক্লিক। আরেকটু পরেই সরে যাবে সূর্য, আলোছায়ার খেলা ফুরিয়ে যাবে কড়া রোদে।কতটুকুমাত্র সময়ের জন্য কী পরম যত্নে এই সাজানো। আমাদের চোখেই পড়ে না কতসময়। মানুষ হেঁটে যায় নির্বিকার,যোগাযোগহীন যেন।আমরা কি সত্যই আউটসাইডার?
- ৩. বসন্ত বাতাসে কুড়িগুলো ফুটতে শুরু করেছে রিক্তপর্ণ শাখায়,নতুন পাখির গানের মতন-ফুটি ফুটি করে তবু পুরা ফোটে না। মন উচাটন। আবার ক্লিক। আবার ফটো।
- ৪. কোথা থেকে মাতাল দখিণ বাতাস এসে মুখে চুলে হাতে স্পর্শ বুলিয়ে বলে যায় "আমাকে মনে আছে?"

মনে পড়ে যায়, সব মনে পড়ে যায়। অদেখা অধরা হাওয়া মনে পড়িয়ে আমার দেশে আমগাছে গাছে মুকুল এসেছে, মৌমাছিদের ডানায় জেগেছে চঞ্চলতা। এ হাওয়া ধরা দেয় না ছবিতে, শুধু হদয় ছুঁয়ে দিয়ে আমূল নাড়িয়ে দিয়ে চলে যায় অচেনায়। তুলাতুলা মেঘে রেখে যায় চলে যাওয়াটুকুই।

তুলিরেখা



লীলেনচরিত

আমাদের বেলায়ং দিন. আমাদের বেলায়ং দিন.. আমাদের বেলায়ং দিন...

মাহবুব লীলেন



কেবল, লিখিও উহা ফিরত চাহো

- ১ ইয়ো ইয়ো খেলার মত জীবন ও আমাদের যাত্রাপথ। মসৃণ নারিকেল তেলের মৃদু ঘ্রাণে অস্থির হলুদ পাইন সজ্জায়। আলমোড়া ভাঙ্গার পর, সকালে ঘুম থেকে উঠে সে প্রবেশ করে অন্ধকার গুহায়। লৌহনির্মিত মুদ্রার সাথে সহবাস দিনভোর। কর্কশ শব্দনগরীর খররৌদ্রের কণামাত্রে তার প্রবেশাধিকার নেই, এখন কেবল ঘুমানোর সময়।
- ২ ঘুম ভাঙ্গে অনেক রাত্রে। মদ্যপানের শিথিল আচরণে মেঘগুলো সরে সরে যায় জ্বলন্ত চাঁদের উপর দিয়ে। এমন অলৌকিক আম্রগন্ধে ঘ্রাণে কামাতৃর প্রবেশ।
- ত তারপর অনন্ত রাত্রি জুড়ে লেখালিখি, কি বোর্ডের সঙ্গে সা রে গা মা সাধা, সিগারেটের ধোঁয়ার হিজিবিজি মিটমিটে চোখ নিয়ে সে তাকিয়ে আছে, তোড়ার অন্য চাবিগুলোর সঙ্গে।

কারুবাসনা



ছায়া ঘনাইছে

সক্কাল বেলা সবার আগে যার সাথে নাতাশার দেখা হয় সে হল আইপড কানে শফিক। শফিক তার প্রজেক্ট সুপার ভাইসার। প্রথম দিন 'শ্যাফিক' বলে ধমক খেয়েছে—"ইটস শফিক, নট শ্যাফিক!" সকাল সাড়ে ন'টায় বোর্ড মিটিং বাদে বাকী সব সময় তার কানে ইয়ার ফোন গোঁজা। তাকে শেষ কবে হাসতে দেখা গেছে সে নিয়ে অফিসে নানান মতভেদ আছে। এমনিতে লোক খারাপ নয়—খালি বড্ড গোমড়া মুখো।

শফিকের কিউবিকল থেকে দক্ষিন পশ্চিমের ছোট্ট কিউবিকলে বসে নাতাশা। মাত্র গত মাসে সে ইন্টার্ন হিসেবে জয়েন করেছে এই ফার্মটায়। সবার সাথে এখনো তেমন করে পরিচয় হয়ে ওঠেনি।এখানে লোকজন সব কেমন জানি পাগলাটে পাগলাটে।

লাঞ্চের পর শফিক এসে জানাল, বাল্টিমোরে আড়াইটের সময় এক ক্লায়েটের সাথে মিটিং। সে সাথে যেতে চায় কি না। কিউবিকলটায় দমবন্ধ একটা ভাব আছে। নাতাশা সানন্দেই সায় দিল।

"তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে তো? একসাথে গেলে আপত্তি নেই তো??"

ওহ, এই তাহলে ব্যাপার! তাকে ড্রাইভার হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে!!

রাগটা গিলে ফেলে নাতাশা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে 'সিওর!'

মিটিং শেষ করে চারটের সময় যখন তারা রাস্তায় নামল, তখন তাদের সাথে আকাশ থেকে বৃষ্টিও নামল ঝুপ করে।ঝুম বৃষ্টি। গজ খানেক দুরের জিনিসও ভাল করে দেখা যা ্চেছ্ না। শফিক বলল শোল্ডারে গাড়ি দাড় করাতে। বৃষ্টি একটু কমলে রওনা দেয়া যাবে।

গাড়ির ছাদে ঝুপঝাপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ির ভেতর অস্বস্তিকর রকমের নীরবতা। বৃষ্টির ঝরোখা তাদের বাকী পৃথিবী থেকে আলাদা করে রেখেছে।খচমচ করে ব্যাগ থেকে আইপড বের করতে গিয়ে নীরবতাটা শফিকই ভাঙ্গল। লক্ষিত মুখে বলল, "ইয়ে, আমি গান শুনলে আপত্তি নেই তো? তুমি তোমার ইচ্ছে মত গান বাজাতে পার। আমার ইয়ারফোনটা বেশ ভাল। বাইরের শব্দ বেশ ভাল করে আটকে দেয়---'

"না, না, আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি শোনো।" একটু থেমে নাতাশা যোগ করল, "তুমি খুব গান পছন্দ কর দেখা যায়"।

একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। শফিকের মুখে কী সামান্য হাসির ইশারা দেখা গেল!?

```
"গান আমার একমাত্র বিনোদন।"
"কী ধরনের গান পছন্দ তোমার ? রক, হিপ-হপ.."
"আমার আসলে ইংরাজী গান তেমন শোনা হয় না, আমি আমার দেশের গান শুনি.."
"उर, रें छियान मुर्ভि সংস?-আमात क्रमार रें रें छियान, সে খুব শान.."
প্রায় হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মত করে শফিক রুক্ষ কন্ঠে জানাল, "আমি ইন্ডিয়ান না। আমি বাংলাদেশি, বাংলাদেশ
হল.."
"আমি জানি বাংলাদেশ কোথায়, আমাকে এত গাধা ভাবার কোন কারন নেই"
"সরি, আমি আসলে এইভাবে বলতে চাই নি-", বিব্রত কণ্ঠে শফিক জানায়।
গাড়িতে আবার নীরবতা। চারপাশে ঝিম ধরানো বৃষ্টির শব্দ। গাড়ির কাচে বাষ্প জমে ঘোলাটে হয়ে আছে চারদিক।
-তোমার আইপডটা কোন জেনারেশান? ফিফথ? অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙ্গার প্রচেষ্টা নাতাশাই নিল।
-নাহ,ফোর্থ।
-৬০ জিবি?
-নাহ, ৩০।
-13
-এইটা নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে, জান?
নাতাশা একটু আশ্চর্য হল বাক-সংযত শফিকের এহেন বাক্যস্ফুর্ত্তিতে।
```

ঝগডাঝাটি মেটাতে পারলে ভাল---নাহলে তাদের অমতেই বিয়ে করব।

কেমন জানি অন্যরকম দেখাচ্ছে। চোখ তার যেন অসীমে নিবদ্ধ।

-তখন আমি পিএইচডি করছি। দেশে আমার প্রেমিকা।সাড়ে তিন বছর পর দেশ ঘুরতে যাই। দেখা গেল আমাদের কারোরই বাবা-মা রাজি না এই বিয়েতে।আমরা ঠিক করি ওদের কে এক বছর সময় দেব। এর মাঝে ওরা তাদের

এইটুকু বলে শ্বাস নিতেই যেন শফিক থামল। নাতাশা ঠিক বুঝতে পারছে না, তার কী বলা উচিত এখন। শফিককে

-পরের বছর ডিসেম্বরে বিয়ে হবে। আমার বন্ধুরা খুব উল্লসিত এই সংবাদে। একজন ঘোষনাই দিয়ে বসল—আমার বিয়েতে তার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে থাকবে একটি আইপড। সে জানত আমি একটা আইপড কেনার জন্যে কতদিন ধরে আঁকুপাঁকু করছি। আমি বললাম, ডিসেম্বর তো এখনো অনেক দেরী। আগাম শুভেচ্ছা হিসেবে একটু জলদি দিয়ে দেয়া যায় কিনা? সে বলল, বিয়ের আগের দিন হলে সে বিবেচনা করতে রাজী আছে---

কাহিনীটা কোনদিকে যাচ্ছে,নাতাশা ঠাহর করতে পারছে না।কেমন জানি একটু ভয় ভয়ও লাগছে।কামড়ে টামড়ে দেবে নাতো—

-যাই হোক, লম্বা গল্প ছোট্ট করে বলে দিই, মেয়েটার সাথে আমার বিয়ে আর হয় নি। নাহ, বাবা-মা'র অমতের কারনে নয়। মেয়েটার নতুন প্রেমিক যোগাড় হ্বার কারনে।

--আ-আমি দুঃখিত,খুব দুঃখিত।

প্রথম বারের মত শফিক কে হাসতে দেখা গেল।

--যাক, আসল ঘটনা হল এই যে, আমি যেদিন এই ঘটনাটা জানলাম সেদিনই অন-লাইনে এই আইপড অর্ডার দিই। নাহ, তখনো আমার টাকা ছিলো না।তবে ক্রেডিট কার্ড ছিল। দু দিন পর যখন আমি আইপড কানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমার সেই বন্ধুর সাথে দেখা। সে জানত গোটা ঘটনা। দেখলাম বেশ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি হাসতে হাসতে বললাম, কী আইপড দেখে অবাক? বিয়েটা হচ্ছেনা দেখে ভাবলাম, তুমি তো আর আইপড দিচ্ছ না উপহার হিসেবে। তাই নিজেই কিনে ফেললাম আর কি—হা হা হা হা----

নাতাশা অবাক হয়ে দেখল,বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে শফিকের গলা খোলা হাসি।

--নাতাশা, বৃষ্টি বোধ হয় ধরে এল। চল রওনা দেয়া যাক।

অনিকেত



লোকমানের বাইসাইকেল

লোকমানের একটা বাইসাইকেল ছিল। রাতবিরেতে সে তার সাইকেলে নিয়ে বের হয়ে যেত, পথে হালকা পাতলা দার্শনিক আলোচনাও হত সাইকেলের সাথে। লোকমান জিজ্ঞাসা করতো "পথের শেষ কোথায়?"। বাইসাইকেল টুনটুন ঘন্টা বাজিয়ে জবাব দিতো, "পথের শুরুতেই তার সমাপ্তি"

আমার বাইসাইকেল নাই। আমার বারোশ' সিসির প্রোটন স্যাভি টুনটুন ঘন্টা বাজিয়ে কথা বলে না। তারপরও সেরেমবানের রাস্তায় এক একটা দিন আমি গল্প শুরু করি..

"তিরিশ হাজার কিলো হয়ে গেল, সার্ভিসিং করানো দরকার" ষোল ভালভের রেনোর ইনজিন নিরুত্তর..

"দিনকাল বড় ই খারাপরে!" ষোল ভালভের রেনোর ইনজিন নিরুত্তর..

"এই বয়সে চাকরী খুঁজতে ভালো লাগে না" ষোল ভালভের রেনোর ইনজিন তখনও নিরুত্তর..

"জুনের পর যে কী করবো!!" স্টেডিয়ামের কাছে এসে ডানের ইন্ডিকেটর কিট কিট আওয়াজ করতে থাকে..। ইউটার্ন নিয়ে দুই নম্বর গেটে পৌছায় গাড়ি। তারপর কার্ড সোয়াপ করে সোজা ৪৪৪ নম্বর গ্যারেজে।

"তোকে বেচা নিয়ে আরেক ভ্যাজালে পড়তে হবে!" ইনজিন তখনও নিরুত্তর। শুধু প্রতিদিনের মতো কোন কারন ছাড়াই এবিএস ফেইলিওরের বাতিটা স্থলে ওঠে।

লিফটের দিকে রওনা দেবার আগে একবার আমার *বাইসাইকেলটার* দিকে তাকাই। কতো অর্থহীন বিষয়েই না আমরা মমতা পুষে রাখি...

অরপ

का विशेष